৪৫.৪ সারাংশ

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর প্রথম অধ্যায়ে 'মঙ্গলাচরণ ও লীলাসূত্র' বর্ণনা আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের জন্ম বর্ণনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'নামকরণ ও চাপল্য বিলাসাদি বর্ণন' বিবৃত হয়েছে। এই অধ্যায় থেকেই জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর পুত্র চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নবদ্বীপধামে জন-জীবনে যে প্রেম-ভক্তি-রসধারার প্লাবন বয়ে যায়, তার চিত্র উদ্ভাসিত।

শচীদেবীর গৃহ হয়ে ওঠে "আনন্দের ধাম"। শিশু গৌরাঙ্গ কাঁদলেই সবাই মিলে হরিনাম কীর্তন করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যনারায়ণের আবির্ভাব ঘটেছে। নানাস্থান থেকে ভক্তগণ ছুটে আসেন সেখানে। নবদ্বীপ হল সবার মিলনস্থল। বৃন্দাবনদাসের ভাষায়—

"নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যগোসাঞি।।'[৯]

নবদ্বীপের আন্তঃসম্পদ তুলনাহীন। পবিত্র গঙ্গা বয়ে গেছে এর পাশ দিয়ে। তার একঘাটেই লক্ষ লক্ষ লোক-জাতিধর্ম নির্বিশেষে স্নান করে পবিত্র হন। মহা পণ্ডিতদের সমাবেশ ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীগণ সেখানে উপস্থিত হন। ভক্তিশূন্য, জ্ঞানমার্গীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই অদ্বৈত আচার্য থেকে নিত্যানন্দ পর্যন্ত ভক্তিরস প্রচারের ধারা বয়ে চলে। ধীরে ধীরে ভক্তির প্লাবনে নবদ্বীপ প্লাবিত হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপ সংকীর্তনে মুখর। ঠিক সেই পুণ্যলগ্নেই শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। জন্মমুহূর্তে শচীদেবীর ঘরে আনন্দ-কলরবে মুখর। নানাদ্রব্য দিয়ে নবজাত শিশুকে নারীগণ আশীর্বাদ করেন। চৈতন্যের কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সকলে হরিধ্বনি দেয়। হরিসংকীর্তনের শচীদেবীর গৃহ মুখর। শ্রীকৃষ্ণের মতোই নবজাত শিশুর আচার-আচরণ। ঘরের জিনিস সব ওলোট-পালোট। 'ভাতের সহিত দেখে ভাঙা দধি দুগ্ধ।' চৈতন্য তখন ৪ মাসের শিশু। ঘরের এই অবিন্যস্ত অবস্থা দেখে নানা জনে নানা কথা বলে। পণ্ডিতগণ বিশ্বম্ভর আর পতিব্রতাগণ নিমাই নামে চৈতন্যদেবের বাল্য নাম ঠিক করেন। নামকরণের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেন। শিশুর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হরিসংকীর্তন শুরু।

দিনে দিনে শচীনন্দন বেড়ে ওঠেন। তার ভয় ডর নেই। সাপ দেখলেই তাকে ধরে। কুণ্ডলী পাকানো সাপের উপর নির্ভয়ে শিশু শুয়ে থাকে। তার রূপ সৌন্দর্য্য চাঁদের সঙ্গে তুলনীয়। গৌরবর্ণ, কমল রূপ নয়ন, অরুণ-অধর-সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পিতামাতা বলাবলি করে—"কোন্ মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া।" হরিধ্বনি শুনলেই শিশু হাসে আর নাচে। ভোরবেলা থেকেই নারীগণ শিশুকে ঘিরে সংকীর্তন করে। ঘরের বাইরে গিয়ে যে যা দেয় তাই সে আনন্দে খায়। সবাই বালকের বুদ্ধি দেখে হতবাক্। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতের বেলায় বালক ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ায় এবং চুরি করে নানা জিনিষ খায় এবং কারো ঘরে কিছু না পেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে ফেলে। একদিন রাতে দুই চোরের চৈতন্যকে অপহরণের বৃত্তান্তে দেখা যায়—তাদের কাঁধের উপর বসে চৈতন্য হাসছে—মানুষজন তাকে 'বিশ্বম্ভর' 'নিমাই' বলে ডাকাডাকি শুরু করে। চোরেরা নিজেদের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যাবার বদলে নিয়ে আসে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। বাবার কোলে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হরিধ্বনি ওঠে। দুই চোর এই ঘটনায় অবাক হয়ে সবকিছু ভেল্কি মনে করে পালিয়ে যায়। সকলে সমবেত হয়ে ঘটনার

কথা জানতে চায় আর শ্রীচৈতন্য সব বৃত্তান্ত জানায়। সকলে দৈবের মায়া ভাবে। পিতা জগন্নাথ একদিন পুত্রকে তাঁর বই আনতে বলেন। চারদিকে রুনুঝুনু বাজনা অথচ চৈতন্যের পায়ে নূপুর নেই। পুত্র বই পিতাকে দিয়ে খেলতে যায়। ঘরের মধ্যে 'অপরূপ পাদচিহ্ন'। সেই সব পাদপদ্ম দেখে পিতা-মাতা বিস্মিত।

এক কৃষ্ণভক্ত তীর্থ পর্যটনে বের হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য দান না করে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। দেশভ্রমণ করতে করতে তিনি জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত। তাঁর কণ্ঠে শুধু 'কৃষ্ণ' নাম। পরম আতিথেয়তায় তাঁকে বরণ করেন জগন্নাথ। কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ নিজ হাতে রান্না বান্না করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন করে ধ্যানমগ্ন হন। ঠিক সেইসময় তাঁর সামনে উপস্থিত 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর'। সে তাঁর নিবেদিত অন্ন থেকে হাসিমুখে একগ্রাস অন্ন মুখে তুলে নেয়। এ দেখে জগন্নাথ মিশ্র রেগে চৈতন্যকে মারতে যান। চিত্রবর তাঁকে নিরস্ত করেন। জগন্নাথ মিশ্র পুনরায় রান্নার আয়োজন করেন। শচীদেবী পুত্রকে নিয়ে অন্য বাড়ী চলে যান। কোথাকার ব্রাহ্মণ তাঁর কুলশীল জানা নেই। তার অন্ন গ্রহণে চৈতন্যের জাত গিয়েছে বলে অভিযোগ করলে হেসে চৈতন্য বলে—'আমি যে গোয়ালা'। তার মর্মকথা কেউ বুঝতে পারে না—সে সকলের কোলে কোলে আছে আর হাসছে। ব্রাহ্মণ রান্না শেষে পুনরায় ভগবানের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদনে মগ্ন ঠিক সেইসময় চৈতন্য কোল থেকে নেমে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একমুঠো অন্ন তুলে মুখে দেয়। ব্রাহ্মণ 'হায়-হায়' করতে থাকে, আর জগন্নাথ মিশ্র লাঠি হাতে পুত্রকে তাড়া করে উত্তম মধ্যম দেবার জন্য। সকলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে অবোধ শিশুকে মেরে কি হবে বলে নিরস্ত করতে চায়। তখন অতিথি ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বলেন—

"বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যেদিনে যে হৈব তাহা হইবার চায়।।"

এরপর বিশ্বরূপ ভগবানের জ্যোতিতে চারদিক উজ্জ্বল হয়। অতিথি ব্রাহ্মণ নিজেকে ধন্য মনে করেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে আবার রান্না করতে বলেন। দু'বার রান্না করে আর তিনি অন্নপাক করতে চান না—ফলমূল খেয়ে দিন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের চরণ ধরে অনুরোধকে উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি পুনরায় রান্না শুরু করেন। শিশু গৌরাঙ্গকে ঘরে বন্দী করে রাখা হলো। এবারও ব্রাহ্মণ অন্ন নিবেদন মুহূর্তে দেখেন শচীনন্দন সামনে। শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপ তার মধ্যে দেখে—

"পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহাকুতূহলে।"

গৌরাঙ্গের পা ধরে ব্রাহ্মণ কাঁদতে থাকেন আর জন্ম-জন্মান্তরের একান্ত ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণা আশীর্বাদের কথা বলে গৌরাঙ্গ তাঁর পরিচয় দান করে। সকলে 'জয় বালগোপাল' ধ্বনি তোলে।

চতুর্থ অধ্যায় 'শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' নামে চিহ্নিত। এই অংশে 'হাতে খড়ি থেকে শুরু করে পিতার কাছে ছলপড়া পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার নানা মধুর চিত্র দেখা যায়। 'হাতে খড়ি' কে শ্রীচৈতন্য অন্যান্য খেলার মতই একরূপ খেলা মনে করে। বর্ণমালা পড়তে পড়তে পাখির পাখা, আকাশের চন্দ্র-তারা পাবার জন্য বায়না ধরে। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করে কিছুতেই শান্ত হয় না। কিন্তু অবাক 'হরিনাম' শুনলেই শিশু আর কাঁদে না। তাই সবাই মিলে হরিনাম কীর্তন শুরু করে। কিন্তু একদিন এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। সেদিন হরিনাম শুনেই বালক নিমাই কাঁদতে থাকে। সবাই কান্না থামানোর জন্য এটা ওটা দিতে চায় কিন্তু কান্না কিছুতেই থামে না। নিমাই বলে—

"..... যদি মোর প্রাণরক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ।।"

তাই করা হলো। পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করে আছেন। তাঁদের নৈবেদ্য যদি সবাই গ্রহণ করে তবেই নিমাই শান্ত হবে। সকলে সেই নৈবেদ্য এনে দেবে বললে নিমাই-এর কান্না থামে। শিশুর কথা শুনে দুই পবিত্র ব্রাহ্মণ অবাক হয় এবং বলেন—

'এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।"

দুই পণ্ডিতের নৈবেদ্য গ্রহণ করে গৌরাঙ্গের আনন্দের আর সীমা নেই। গঙ্গাতে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে স্নান করতে গিয়ে তাঁর কত না কাণ্ড কারখানা। জলের বুকে লুকোচুরি খেলা, জল ছিটিয়ে সন্ন্যাসীদের ধ্যান ভঙ্গ করা, পূজার আগেই বিষ্ণু পূজার প্রসাদ হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খাওয়া, স্নানার্থীদের বস্ত্রাদি এদিক ওদিক সরিয়ে রাখা ইত্যাদি দস্যিপনায় সবাই অস্থির। আবালবৃদ্ধ-বণিতা শচীমাতার কাছে পুত্রের বিরুদ্ধে নানা নালিশ জানায়। মা নিমাইকে বেঁধে রাখবে বলেন আর পিতা রাগে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু নিমাই-এর কোনো দেখা নেই। বাল্য-লীলায় চৈতন্যের চঞ্চল ও অশান্ত রূপ ব্যাখ্যায় বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

" নানা ক্রীড়া করে কেহোনা পারে বুঝিতে।"

হাতে মুখে কালি মেখে হাতে বই নিয়ে নিমাই বাড়ি ফেরে। সকলের অভিযোগের কথা পিতা বললে শান্ত সুরে সে বলে—

"আজ আমি নাহি যাই স্নানে।" তার উপস্থিত বুদ্ধি, বন্ধু বাৎসল্যে ভরা এই অধ্যায়টি নিমাই এর বিস্ময়কর চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে পিতা-মাতা দিশেহারা। তাঁরা মনে মনে ভাবেন—

এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রী বিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ম জন্মিলা মোর ঘর।।"

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই চতুর্থ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

৪৫.৫ সার-সংক্ষেপ

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়টির সারাংশে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই অংশে তিনটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপের মধ্য দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মবর্ণনা থেকে শৈশবক্রীড়া বর্ণনা পর্যন্ত নানা কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এই অংশ পাঠের মধ্য দিয়ে আপনারা গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার পরিচয় পাবেন।

নবদ্বীপ ধামের কীর্তি গাথার মধ্য দিয়ে অদ্বৈত আচার্যের প্রেম ভক্তির ধারাস্নাত রূপ তার বিরোধিতার নানা কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শচীমাতার গর্ভে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম। নবদ্বীপধাম হরিধ্বনিতে মুখর।

নবজাত শিশুর নামকরণ সকলের আশীর্বাদ দান, জগন্নাথ মিশ্রের 'আনন্দধাম' কে ঘিরে ভক্তির প্লাবনধারা বয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নামকরণ ও চাপল্যাবিলাসাদি বর্ণিত হয়েছে। নবজাত শিশুকে পণ্ডিতগণ 'বিশ্বম্ভর' আর পতিব্রতাগণ 'নিমাই' নাম রাখেন। ৪ মাসের শিশুকালেই নিমাই-এর আচার আচরণে কৃষ্মসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সকলেই শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। শিশুর বিন্দুমাত্র ভয় নেই। সাপের সঙ্গে অবহেলাভরে খেলা করে। তার কুণ্ডলীর উপর নিশ্চিন্তে ঘুমায়। ঘরের জিনিষ চুরি করে খায়। কারো বাড়ীতে খাবার কিছু না পেলে ঘরের জিনিষপত্র ভেঙে চুরে ফেলে। রাত-দিনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তার বুদ্ধি দেখে সবাই অবাক। এই অধ্যায়ে অলৌকিক দুটি ঘটনার কথা আছে। একটি হলো দুই চোরের নিমাইকে নিয়ে পলায়নের কথা। অপরটি তীর্থ পর্যটনকারী কৃষ্মভক্ত ব্রাহ্মণের কথা। দুটি ঘটনাতেই নিমাই-এর রহস্যময় লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাল গোপাল' রূপী নিমাই-এর শৈশবচিত্র রোমাঞ্চকর ও রহস্যময়। চতুর্থ অধ্যায়ে "শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' অংশে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার নানা মধুর চিত্র আছে। 'হাতেখড়ি' অংশে চৈতন্যের ছেলেমানুষির সঙ্গে 'হরিনামে'র প্রতি গভীর আসক্তি বিস্ময়কর। এই অংশে পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত ভাগবতের একাদশী উপবাসের নৈবেদ্যকে ঘিরে শিশু নিমাই-এর কর্ম-কাণ্ড-অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার। গঙ্গার বুকে স্নানাদির বর্ণনায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিমাই-এর জল ক্রীড়া, নিমাই-এর নানা কৌতুককর কর্মকাণ্ড, দস্যিপনা ইত্যাদির চিত্র আকর্ষণীয়। চঞ্চল, অশান্ত, উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন হরিনামে বিভোর-সন্তানকে ঘিরে পিতা-মাতার ভাবনা এই যে তাদের পুত্র হয়তো শ্রীকৃষ্মের মায়ারূপ ধারণ করে তাঁদের ঘরে এসেছেন।

৪৫.৬ বৃন্দাবনদাসের পরিচিত ও কবি কৃতিত্ব

১৪৮৬ খ্রিঃ ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায় জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেবের জন্ম। পণ্ডিতগণ 'বিশ্বম্ভর', আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ 'গোরা' গৌরাঙ্গ এবং অদ্বৈত আচার্য্যের স্ত্রী সীতাদেবী 'নিমাই' নামে চৈতন্যদেব চিহ্নিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার নাম হয়েছিল—'কৃষ্মচৈতন্য' সংক্ষেপে 'চৈতন্য'। ঈশ্বরের অবতাররূপী চৈতন্য পূর্ব ভারতের অধিকাংশ স্থানের ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে স্মরণীয়। পায়ে হেঁটে ভারতভ্রমণ, নীলাচলে শেষ জীবন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটানো ইত্যাদি ভাবতন্ময় জীবনকে ঘিরে একই অঙ্গে রাধা কৃষ্মের মিলন রূপ ভক্তবৃন্দের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। মাত্র আট চল্লিশ বছর বয়সে ১৪৫৫ খ্রিঃ তাঁর তিরোভাব ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও বাঙলা ধর্ম,সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে আপনারা 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' অংশে অনেক তথ্য জেনেছেন। এই অংশে অবতারকল্প শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাররূপে বৃন্দাবনদাসের পরিচিতি ও তাঁর কবিকৃতিই আলোচনার বিষয়। তবে তা আলোচনার পূর্বে চৈতন্যদেবের জীবনীকে ঘিরে সংস্কৃতে ও বাঙলা ভাষায় অন্যান্য যে সমস্ত জীবনচরিত লেখা হয়েছে তার তথ্যাদি প্রদত্ত হলো।

চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তাঁর জীবনকে নিয়ে পদ, গান, কবিতা ও নাট্যরচনা শুরু হয়। অদ্বৈত আচার্য এর পথ প্রদর্শক। তবে চৈতন্যের জীবনকাহিনী শ্লোকসূত্রে প্রথম গেয়েছিলেন মুরারি গুপ্ত তারপর স্বরূপ দামোদর। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলাই সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত রচনা করেছিলেন। পরমানন্দ দাস রচনা করেন—'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক। তবে বাঙলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ হলো বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' যা পরে চৈতন্য ভাগবত' নামে খ্যাত।

কবি পরিচিতি ঃ চৈতন্য জীবনীধর্মী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের কাব্যই সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও কাব্যগুণান্বিত। বাঙলা দেশে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী ও তথ্য প্রচারিত হয়েছে, তার অধিকাংশই 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে গৃহীত।

বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্য গ্রন্থে নিজের কথা বিশেষ কিছু বলেননি। চৈতন্যের এক আদি ও মুখ্য ভক্ত ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁরা ছিলেন চার ভাই। শ্রীবাস জ্যেষ্ঠ। তাঁর এক ছোট ভাইয়ের কন্যা 'নারায়ণী' বৃন্দাবনদাসের মা। মাতৃ পরিচয় ছাড়া আর কোনো জীবনী তথ্য কবি দেননি। পিতার নামও নেই। শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে কবির জন্ম হয়েছিল, এ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁর পূর্বসূরী সম্বন্ধে শুধু বলেছেন—

"বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।"

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ অনুচর ছিলেন। নিজেকে তিনি নিত্যানন্দের 'সর্বশেষ ভৃত্য' বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। নিত্যানন্দের অনুমতি পেয়েই তিনি চৈতন্যজীবনী কাব্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

"আন্তর্যামী নিত্যানন্দ বুলিলা কৌতুকে
চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।
অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান।"

চৈতন্যের জীবনী কাহিনী বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্যের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অন্যান্য ভক্তদের কাছ থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

পণ্ডিতগণের অনুমান ১৫১৯ খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। কবি অল্প বয়সেই নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেনুর গ্রামে কবির শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। কবি তাঁর কাব্যের জন্য বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্যলীলায়ব্যাস' বলে সম্মানিত হয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম কবিকে আলোচ্য সম্মানে ভূষিত করেন। বৃন্দাবনদাস প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গাল' নামে কাব্যখানি ভূষিত করেন। কিন্তু প্রায় একই সময়ে কবি লোচনদাস (ত্রিলোচন দাস) চৈতন্যমঙ্গাল' নামে একখানি কাব্য লেখেন। দুটি কাব্যের নাম এক হলে ভবিষ্যতে গোলমাল হবার সম্ভাবনা দেখে মা নারায়ণী বোধ হয় পুত্রকে কাব্যের নাম বদল করার নির্দেশ দেন। বৃন্দাবনদাসও মায়ের কথামত গ্রন্থের নাম বদলিয়ে 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্যমত হলো 'চৈতন্য-ভাগবতে' শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাবিন্যাস অনুসৃত হয়েছে বলে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কাব্যখানির নামকরণ করেন 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। এই অনুমানটি অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়।

'চৈতন্যভাগবতের'র রচনাকাল নির্দেশ করা সহজ নয়। ১৫৩৩ খ্রিঃ, ১৫৪৮ খ্রিঃ, ১৫৭৪ খ্রিঃ ইত্যাদি নানা গবেষক বিভিন্ন খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের তিরোধানের অল্প কিছুদিনের মধ্যে কাব্যখানি রচিত হয়েছে। ১৫৪২ খ্রিঃ পরে কাব্যখানির রচনা সমাপ্ত হয়। এরচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য কোনো যুক্তিসংগত সন-তারিখ পাওয়া যায় না।

কাব্য পরিচিত ও কবিকৃতি ঃ বৃন্দাবনদাস তিনখণ্ডে কাব্যখানিকে বিন্যস্ত করেছেন। আদিখণ্ড (পনেরো), মধ্যখণ্ড (ছাব্বিশ), অন্ত্যখণ্ড (দশ) মোট একান্নটি অধ্যায়ে এই সুবৃহৎ জীবনীকাব্য সমাপ্ত। তবে চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের বৃত্তান্ত অন্ত্য খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। কবি যেন হঠাৎ কাব্যের সমাপ্তি রেখে টেনেছেন। কাব্যটির এটি একটি বিশেষ ত্রুটি বলেই চিহ্নিত।

শ্রীচৈতন্যের বাল্য-কৈশোর লীলা এই এককে আলোচিত। এই পর্যায়ের চৈতন্যলীলা সম্পর্কে নানা তথ্যাদি কবি বোধ হয় গদাধর ও অদ্বৈত প্রভুর কাছ থেকে শুনে থাকবেন। তবে কাব্য পরিকল্পনায় তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার লীলা প্রসঙ্গাদিও কবিকে প্রভাবিত করেছিল।

সহজ, পরিচ্ছন্ন, সর্বজন চিত্তাকর্ষী জীবনীকাব্যরূপে এর মূল অপরিসীম। অবশ্য কবি অধিকাংশ স্থানে অলৌকিক বাতাবরণের অন্তরালে চৈতন্যলীলা অনুসরণ করেছেন বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনী ও চরিত্রের ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উপরন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের রচনা বলে কবি কোনো কোনো জায়গায় চৈতন্যবিরোধীদের প্রতি কটূক্তি করেছেন। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও। এই জীবনী কাব্যে জীবনকথা, চৈতন্য ধর্মসম্প্রদায় ও চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তির কথা কবি যে রকম সরলভাবে বর্ণনা করেছেন, তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোর লীলার বর্ণনায় কবি যে ধরনের বাস্তবতা, সরলতা ও লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য কোনো চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। শ্রীচৈতন্যের মানবমূর্তি ও ভাবমূর্তির ভারসাম্য রক্ষায় কবির কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হয়। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব তারিফযোগ্য। বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, করুন বেদনার আবেশ ব্যাকুলতা, চৈতন্যের শৈশবকালের চাপল্যের চিত্র প্রকাশে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাপুরুষের ভাগবত জীবনালেখ্য হয়নি। কবির বর্ণনায় সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই দিক থেকে বৃন্দাবনদাসের কাব্যখানির মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

সুরে, তালে আবৃত্তি ও গান করবার উদ্দেশ্যেই কাব্যখানি লেখা হয়েছিল। এজন্য মাঝে মাঝে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি পদে ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার কবি করেছেন।

সে যুগের প্রচলিত ধুয়া-গানও কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। ছেলে-ভুলানো ছড়া জাতীয় পদও পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের সংস্কৃত জ্ঞান অগাধ ছিল। তিনি ভাগবতগ্রন্থ ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থও গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এর প্রমাণ গ্রন্থের বহু শ্লোকে পাওয়া যায়। চৈতন্য নিত্যানন্দকে কবি কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে গণ্য করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় ভালোবাসা ও বিশ্বাস যে ছিল তার পরিচয় কাব্যগ্রন্থে আছে। এই ভক্তি ও বিশ্বাস এবং ভালোবাসার একনিষ্ঠ কাব্যখানি কোমল মধুর ও রসাপ্লুত হয়েছে। চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা কবি প্রত্যক্ষ না করলেও তিনি চৈতন্যদেবের যে চিত্র এঁকেছেন তা জীবন্ত ও সত্যরূপ পেয়েছে। তাঁর হাতে চৈতন্যদেব রক্তমাংসে গড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক মানুষ হয়েও প্রকৃতিগত দিক থেকে 'অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, অতন্ত হৃদয় গ্রাহী মানুষ' হয়েছেন। ড. সুকুমার সেনের এই মন্তব্যটি যথার্থ। সূক্ষ্ম তুলির টানে বৃন্দাবনদাসের শিশু চৈতন্যের মনোরম বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

বাঙলা জীবনী সাহিত্য রচনার পথ প্রদর্শক হিসাবে বৃন্দাবনদাস চিরস্মরণীয় কবিরূপে স্বীকৃত।

৪৫.৭ নবদ্বীপ চিত্র

'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডে নবদ্বীপধামের সামাজিক অবস্থা জীবন্তরূপে বৃন্দাবনদাস অঙ্কন করেছেন। আদিখণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় আপনারা পাঠ করলেই চৈতন্যের বাল্য লীলার পাশাপাশি নবদ্বীপের সমাজ চিত্রের নানারূপরেখা করতে পার। এই অংশে তথ্যসহ সমাজচিত্রের তথ্যাদি দেওয়া হলো।

কলিযুগে এই জ্ঞানপীঠরূপিনী নবদ্বীপধামে চৈতন্যের আবির্ভাব। বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন চট্টগ্রামের, রাঢ় অঞ্চলের, শ্রীহট্টের, উড়িষ্যার এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকেও বহু ভক্তজন এই নবদ্বীপধামে মিলিত হতেন। নবদ্বীপের উজ্জল চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি বলেছেন—''নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।' এখানেই কবি থামেননি। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন—'সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম, পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর'দেব প্রমুখ জ্ঞানী গুণীর অবস্থানের পাশাপাশি প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ 'ভবরোগবৈদ্য, 'শ্রীমুরারীও এখানে বাস করতেন। চট্টগ্রাম থেকে চৈতন্যবল্লভ দত্ত যেমন আসেন, তেমনি বুড়ন থেকে হাজির হন ভক্ত হরিদাস। রাঢ় অঞ্চলের এক চাকা গ্রাম থেকে আসেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। গঙ্গাতীরে ভক্তিপ্রাণা ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ঘটত। সেখানে পবিত্রতার আলো বিকিরণ হত, নবদ্বীপে অবতাররূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটবে—এই ধ্যান ধারণাকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে জড়ো হয়েছিলেন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ।

নবদ্বীপে পাশ দিয়ে পবিত্র গঙ্গানদী বয়ে চলেছে। তাতে বহু ঘাট। এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে। কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব সামাজিক, ধর্মীয় বাধা ব্যবধান দূর করে গঙ্গার পূণ্য সলিলে অবগাহন করে দেহ মনকে পবিত্র করে। বিদ্যার দৈবী সরস্বতীর সস্নেহ দৃষ্টিপাত ঘটেছে নবদ্বীপে। যার ফলে এখানে মহা পণ্ডিতদের সমাবেশ যেমন ঘটেছে, তেমনি বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান রূপেও নবদ্বীপ সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপকের যেমন সীমা-সংখ্যা নেই, তেমনি পাঠার্থীরাও সীমাহীনতা নবদ্বীপকে করেছে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্রস্থল হলেও ভক্তি রসের ধারা তখনও প্রবাহিত হয়নি। আমরা জানি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম এ তিনের যোগফলেই মানুষ পূর্ণ হয়। প্রাক্ চৈতন্য যুগে নবদ্বীপে 'ধর্মকর্ম' ছিল, কিন্তু ভক্তি ছিল না। মঙ্গালচণ্ডীর গীত নবদ্বীপকে মুখর করে তুলত। কেউ কেউ 'বিষহরি'র পূজাও করত। এইসব পূজা পার্বনে দেব-দেবীর নানা প্রতিমা বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হতো। পুত্র কন্যার বিবাহে আড়ম্বরের ঘাটতি ছিল না। বিষয়-বাসনাযুক্ত মানুষেরা ভক্তিহীনভাবে দিন যাপন করতো। শাস্ত্র অধ্যয়নই একমাত্র কর্ম ছিল কিন্তু যুগধর্ম ব্যাখ্যান বা শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন তখন নবদ্বীপে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। গঙ্গাস্নানের সময় শুধু কেউ কেউ 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করত। গীতা-ভাগবত যে সব পণ্ডিত জানতেন বা পড়তেন, তারা শুধু রসশূন্য তত্ত্বকথাই শোনাতেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় বিন্দুমাত্র ভক্তিরস ছিল না। এককথায় তৎকালীন নবদ্বীপের সংসার ছিল ভক্তিহীন। তবে ভক্তিরস পিপাসু যারা ছিলেন তারা মনে মনে দুঃখ পেতেন।

নবদ্বীপবাসী যখন বিষয়-বাসনা সুখে মগ্ন ঠিক সেই মুহূর্তেই বৈষ্ণব সমাজের অগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব নবদ্বীপে। তিনিই প্রথম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে যুক্ত করে 'কৃষ্ণপদ ভক্তিসার'—তত্ত্বটি প্রচার করেন। গঙ্গাজল ও তুলসীর মঞ্জুরী দিয়ে রাতদিন কৃষ্ণের সেবা করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু ভক্তিযোগশূন্য নবদ্বীপের জন্য মনে দুঃখ পান। তৎকালীন যুগে মদ-মাংস যজ্ঞ পুজাও হতো, কেউ বা নানা উপাচারে বাশুলী দেবীর পূজাও করত। রাতদিন চলতো নাচ, গান ও বাজনার মত্ততা। কেউই কৃষ্ণনাম শুনতে চাইতো না। এই বিষয় বাসনাযুক্ত, অধঃপতিত নবদ্বীপবাসীর উদ্ধার চিন্তায় অদ্বৈত মহাপ্রভু গভীর ভাবনায় মগ্ন হন। তিনি প্রথমে সংকীর্তনের মাধ্যমে মৃত জীবনে আনতে চাইলেন নূতন ভক্তির প্রাণবন্যা। শ্রীকৃষ্ণের পূজা পার্বন একাগ্রচিত্তে করে তিনিই নবদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে চৈতন্যদেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। নবদ্বীপে এরপর পণ্ডিত শ্রীবাসের মন্দিরে 'চৈতন্য বিলাস' স্থাপিত হয়। অদ্বৈত মহাপ্রভু ভাইদের নিয়ে কৃষ্ণনাম শুরু করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ। একদিকে শুরু হয় সংকীর্তন অন্যদিকে পাষণ্ডের দল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুরু করে। শ্রীবাস নিজের ঘরে বসে কৃষ্ণনাম করেন। ব্রাহ্মণের দল আশঙ্কায় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর সংকটে আবর্তিত হয়েও জোরালো কণ্ঠে বলেন—

"শোনো শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ম সর্ব নয়ন গোচর।।"

শুধু কথা হয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু। নিজের মন্দিরেই কৃষ্মের পাদপদ্মে ভক্তগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন, আর ভক্তিযোগের কথা শোনেন। ভাগবতের এইসব পরম ভক্তগণ নবদ্বীপ ধাম ঘুরে ঘুরে ভক্তির প্রচার করেন। ভক্তিযোগের কথা শুনে কেউ কেউ আবেশে বিহ্বলিত হন, আবার কেউ কেউ বহমান স্রোতের বিরোধিতার জন্য দুঃখ পান। নানাদিক থেকে বাধা আসে। তবু ভক্তিবাদীরা নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন। এরপরই নিত্যানন্দের আবির্ভাব। ধীরে ধীরে ভক্তির প্লাবনে নবদ্বীপধাম প্লাবিত হয়। এই প্লাবন ধারার মধ্য দিয়েই মাতা শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের জন্ম।

ভক্তিশূন্য, জ্ঞানমার্গীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণে মত্ত বিষয় বাসনাযুক্ত নবদ্বীপের সামাজিক অবিন্যস্ত অবস্থার মধ্যেই কীভাবে অদ্বৈত আচার্য থেকে নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পর্যন্ত ভক্তিরস প্রচারের ধারা বয়ে চলেছিল, তার স্পষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করলেই আপনারা জানতে পারবেন। নবদ্বীপের সমাজচিত্রটি যেমন জীবন্ত হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক ধারাতেও স্নাত। সাহিত্য-সমাজের প্রকৃত দর্পণ। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে তারই সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব শক্তি, সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও জনচিত্ত মুগ্ধ করার শক্তি যেমন ছিল, তেমনি তৎকালীন সামাজিক প্রথা, সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব—ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অনুপুঙ্খ বাস্তব পরিচয় দানের সুনিপুণ দৃষ্টি ও দক্ষতা ছিল। এসবের জন্যই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের কাছে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে মূল্যবান গ্রন্থ বলে সমাদৃত। তাঁর আদিখণ্ডটি সম্পূর্ণ নবদ্বীপকে ঘিরেই রচিত।

৪৫.৭.১ সমাজচিত্র

রাসলীলাকে ঘিরে গোপীসমাজে অনন্ত প্রেমের বন্যা বয়ে যেত। প্রথমদিকে জগতের উৎপত্তি স্থিতিলয়ের তত্ত্ব রয়েছে। আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে কবি তিনখণ্ডের মূল বিষয়বস্তুকে সূত্রাকারে তুলে ধরে মুখবন্ধের সূচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই কৃষ্মের অবতাররূপী শ্রীচৈতন্যের কলিযুগে আবির্ভাব এবং হরি সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে গৌরচন্দ্রের অবতার রূপটি তুলে ধরেছেন। নবদ্বীপ চিত্রের মধ্যে এর আলোচনা কিছুটা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চৈতন্যের জন্ম মুহূর্ত থেকে সমাজ জীবনের চিত্রও খুবই আকর্ষক।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপধাম সংকীর্তনের মুখর। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই হরধ্বনিতে মেতে পুষ্পবৃষ্টি করছে—সেই আনন্দ-রস-ঘন মুহূর্তে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তৎকালীন যুগে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি মানুষের খুব অনুরাগ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহা জ্যোতির্বিদদের গণনায়—

"লগ্নে যত দেখি বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তারে দিতে নাহি সীমা।।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে বিদ্যা
অল্পেই হইব সর্বগুণের নিধান।।"

চৈতন্যের জন্ম লগ্নে ভক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। এছাড়া তৎকালীন সমাজে জাত-পাত, শৈব-বৈষ্ণব, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সম্প্রীতি ছিল না। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ শাসিত হিন্দুধর্মের অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর প্রতি চলত ধর্মের নামে নানা অত্যাচার। এর ফলে অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে আত্মসম্মানের পথ বেছে নেয়। মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুদের প্রায়ই বিরোধ লাগতো। এই ধর্মীয় নগ্ন দ্বন্দ্ব অভিঘাতের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপনের জন্যই চৈতন্যের আবির্ভাব। চৈতন্যের জন্মলগ্নেই নিবিড় ঐক্যের সুর সমাজ জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। হিংসা দ্বেষ পূর্ণ সমাজে মুসলমানগণ 'যবন' নামে ঘৃণার পাত্র ছিল।

শুভদিনে মৃদঙ্গ, সানাই, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। ধানদূর্বা দিয়ে নবজাত শিশুর 'চিরায়ু' কামনা করা হতো। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। চৈতন্যদেবের জন্মকে ঘিরে সমগ্র নদীয়া জেলাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়। সংস্কার বলে নিত্যানন্দের জন্মলগ্ন 'মাঘশুক্লা ত্রয়োদশী' আর গৌরচন্দ্রের জন্ম লগ্ন 'ফাল্গুনী পৌর্ণ-মাসী'। এই দুই তিথিকে সবাই পুণ্য বলে মনে করত। এই দুই তিথিকে ঘিরেই শুভকর্ম সম্পাদন হত।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে 'হাতে খড়ি' দেবার চিত্র। শিক্ষা আরম্ভের মুহূর্তে হাতে খড়ি দেবার কথা তৎকালীন সমাজে ছিল—সেই ধারা আজও বহমান। নৃত্যচর্চা, একাদশীর উপবাস পালনের কথাও আছে। গঙ্গায় স্নান নবদ্বীপের এক বিশেষ আকর্ষ। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের পূজারীরা শিবলিঙ্গ, গীতা, বিষ্ণু ইত্যাদির পূজা গঙ্গার তীরেই করত। শিশু বিশেষ করে কিশোরদের গঙ্গা বক্ষ ছিল জল কেলির পরম আকর্ষণ স্থল। যজ্ঞাদির ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে পিতা-মাতা-সন্তানের কল্যাণ কামনায় আগ্রহী ছিলেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৌরাঙ্গের 'যজ্ঞ স্বপ্নে'র চিত্রটি তার সাক্ষ্য বহন করে। ব্রাহ্মণকে বলা হতো 'দ্বিজ'। পৈতা ধারণ উপলক্ষে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করার রীতি ছিল। নবদ্বীপ তখন অধ্যাপক মণ্ডলীর জ্ঞানতীর্থ ছিল। ব্যাকরণ, শাস্ত্রাদি এককথায় জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ। গঙ্গা স্নান শেষে পবিত্রচিত্তে পঠন-পাঠন চলতো। গুরুগৃহে পঠন-পাঠন—এককথায় নবদ্বীপে তখন যে টোল ছিল সেই টোলেই বিদ্যাচর্চা চলত।

মধ্যযুগীয় ট্র্যাডিশনে দৈবস্বপ্ন দেখা, বরমাগা ইত্যাদি দেখা যায়। বৃন্দাবনদাসের কাব্যেও এই ধারা বহমান। জগন্নাথ মিশ্রের স্বপ্ন দেখা ও বরমাগা এর দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে নিমাই-এর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের চিন্তা স্বপ্নে দেখে জগন্নাথ মিশ্রের মানসিক অবস্থা এবং সহধর্মিণী শচীর কাছে তা বর্ণনার মধ্যে আমরা বিস্তৃতভাবে পাই। সন্তান-সন্ততিকে ঘিরে তৎকালীন পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। কিন্তু সেই পুত্রের সন্ন্যাসী হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা তৎকালীন পিতৃ-মাতৃ-সর্বস্ব স্নেহ ভীরু সংসার জীবনের চিত্রটি বৃন্দাবনদাস সযত্নে তুলে ধরেছেন। ফুলের মালা, চন্দন ইত্যাদি ছিল তৎকালীন যুগে পবিত্রতার প্রতীক।

"দিব্যমালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গা স্নান করি চাঞ পূজিবারে।।"

গৃহ বধুরা মাটির কলসী ভরে জল নিয়ে ঘরে যেত তার প্রমাণও আছে। গৌরাঙ্গদেবের কলস ভেঙে ফেলার দৃষ্টান্ত তার সাক্ষ্য বহন করে। ঘরে শিকা টাঙানো থাকতো, তার উপরে তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য ইত্যাদি রাখা হত। গৌরাঙ্গদেবের ঘরে 'লঙ্কাকাণ্ড' দৃশ্যে তা বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষ্মীপূজা, বেদপাঠ ঘরে ঘরে হতো। তৎকালীন সমাজে অলৌকত্বের ছাপ ছিল। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায় নূপুরের শব্দ, পায়ের ছাপ, গঙ্গা পূজার শেষে গৌরাঙ্গের দুইতাল সোনা মাকে এনে দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ মাথা মুণ্ডণ করে পৈতা ধারণ করে প্রকৃত 'দ্বিজ' হতো। শাস্ত্র পাঠ ঘরে ঘরে হত। তৎকালীন

সমাজ জীবনে পুত্রকন্যাদির অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে সবাই মত্ত থাকত। কেউ কৃষ্ম নাম করতো। না। মাঠে মাঠে গোরু চরাত, শিশুরা ধনুকের বাণ মেরে তার পেড়ে তা মনের আনন্দে খেতো। তীর্থযাত্রা তখন আকর্ষণীয় ছিল। বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কাশী ইত্যাদি স্থানে তীর্থযাত্রায় সবাই যেতো। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সমাজে পরনিন্দা পরচর্চাও ছিল। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন সমাজ জীবনের অনেক খণ্ড খণ্ড চিত্র আমরা পাই। তবে প্রতিটি চিত্রই বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত, যার ফলে চৈতন্যের ভাবলীলা স্ফূরণে এই জীবন্ত সমাজচিত্র নানাভাবে সাহায্য করেছে। ভাববাদী ভক্তিবাদী কবি বৃন্দাবনদাসের বাস্তববাদী দৃষ্টি ভঙ্গির প্রমাণ আমরা আদিখণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে পাই। আপনারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করে তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা তথ্য জানতে পারবেন। এখানে সেই তথ্যগুলিই সন্নিবেশিত হল। এই অংশটি পাঠ করে নবদ্বীপ ও এই শহরকে কেন্দ্র করে নদীয়া জেলার সমাজ জীবনের কথা জেনে নিজের ভাষাতেই সবকিছু লিখতে পারবেন।

৪৫.৮ শ্রীচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ "মিশ্র পুরন্দর" বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসেন। মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ-শচীদেবীর সংসার মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। বড় ছেলে বিশ্বরূপ। তারপর কয়েকটি সন্তানের জন্ম মুহূর্তে মৃত্যু। শেষে বারো বছর পরে ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রিঃ) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম। জন্ম মুহূর্তে চাঁদে গ্রহণ লেগেছে, গঙ্গাতীরে স্নানার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন। নবদ্বীপের পথ ঘাট শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতেও হরি সংকীর্তনের মুখর। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় চৈতন্যের জন্ম বর্ণনা আপনারা পাবেন। চৈতন্যের জন্ম লগ্নের বার্তার বর্ণনায় দেখা যায়—

"গৌরচন্দ্র আর্বিভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে।"

শ্রীচৈতন্যের গায়ের রঙ ছিল খুব ফর্সা। তাঁর দেহকান্তির জন্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তার নাম রাখে "গোরা"- "গৌরাঙ্গ", আর অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী নবজাতকের নাম দেন "নিমাই"। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'বিশ্বরূপে'র সঙ্গে মিল রেখে চৈতন্যের ভালো নাম রাখা হয় "বিশ্বম্ভর'।

শৈশব ঃ মাতার প্রবল স্নেহ, পিতার কিছুটা শাসনের মধ্য দিয়ে সাধারণ ছেলের মতোই চৈতন্যের শৈশব অতিবাহিত হয়। জ্যৈষ্ঠপুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের পর শচীদেবীর চোখের মণি হয়ে দাঁড়ায় চৈতন্য। অজানিত আশঙ্কায় পিতা-মাতা চৈতন্যকে টোলে পাঠাতে চাননি। কিন্তু ছেলের জেদের কাছে হার মানতে হয়। মেধাবী চৈতন্য অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যায় পারদর্শী হন। তার জ্ঞান-যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পিতার মৃত্যু চৈতন্যের সংসারের দিকে মন দিয়ে ষোল-সতেরো বছর বয়সেই নিজেই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সহধর্মিণীরূপে নির্বাচন করে ঘরে আনেন। টোল খুলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াতেন। সুদর্শন, চরিত্রবাণ, পণ্ডিত চৈতন্য নবদ্বীপবাসীর হৃদয় জয় করে নেয়। অদ্বৈত আচার্যের মতো বহু প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ চৈতন্যকে স্নেহাদৃত ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতেন। চৈতন্যের সাথী-সঙ্গীরা তার আনুগত্য স্বীকার করতো। চৈতন্য ভাগবতের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ে তার পরিচয় আছে। চৈতন্যদেব কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাঙলাদেশে) যান। প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের সঙ্গে তার সেখানেই মিলন ঘটে। পিতৃ সম্পত্তি দেখাশুনা করে অর্থাদি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যুর ঘটনা শুনে তিনি প্রচণ্ড আঘাত

পান। এরপর থেকেই শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে চৈতন্যের যাতায়াত এবং কীর্তন গানে তন্ময়তার খবর পেয়ে শচী মাতা চিন্তিত হয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। এদিকে হরিদাস নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন। তাঁদের সঙ্গ পেয়ে চৈতন্য মেতে উঠলেন। কাজীর আদেশ অমান্য করে পথে পথে সংকীর্তন। চৈতন্যের জয়ধ্বনিতে নবদ্বীপ আন্দোলিত।

এরপর চৈতন্য শিষ্যদের নিয়ে গয়াতে পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ পান। তাঁর কাছে তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভক্তিভাবে তন্ময় হয়ে চৈতন্য বৃন্দাবন মথুরায় ছুটে যান। সঙ্গী-সাথীরা অনেক চেষ্টায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু ঘরে আর মন নেই। কিছুদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে থেকে চৈতন্য পুরী চলে যান স্থায়ী বসবাসের জন্য। পুরীতে পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও কাশী মিশ্রকে ভক্তরূপে পান। কাশী মিশ্রের বাগানবাড়ীতে চৈতন্য বসবাস শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই উড়িষ্যার রাজা ও রাজপরিজন চৈতন্যের ভক্ত হন। ধীরে ধীরে বাঙলা ও উড়িষ্যার জনগণ চৈতন্যকে দেবতারূপে মেনে ভক্তি-শ্রদ্ধার আসনে বসান।

এরপর চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। এক বছরের উপর পদব্রজে প্রায় সবস্থান ঘুরে রামানন্দ রায়, পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে মিলিত হন। এরপর পুরীতে ফিরে তিনি পুনরায় বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অরণ্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে মহানন্দে তিনি কাশীধামে পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন ভক্ত তপনমিশ্র, বৈদ্য চন্দ্রশেখর ও কীর্তনীয়া পরমানন্দ। কাশী থেকে প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ব্রজমণ্ডলে অবস্থানের সময় চৈতন্য ভাবাবেগে মগ্ন হন। সেখান থেকে প্রয়াগে আসেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হন রূপ, রূপের ভাই বল্লভ ও সনাতনের সঙ্গে। রূপ সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে লীলাচলে ফিরে আসেন।

জীবনের শেষ আঠারো বছর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাভাবে আবিষ্ট হয়ে নীলাচলেই তিনি জীবন কাটান। ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৪ খ্রিঃ) রথযাত্রার পরই মাত্র ৪৮ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কার্য-কারণ সম্পর্কে নানা অভিমত আছে। জগন্নাথদেবের দেহে বিলীন, সমুদ্রের বুকে বিলীন, পায়ে কাঁটা ফুটে তা থেকে বিষাক্ত ব্যাধি, গুপ্ত হত্যা—ইত্যাদি নানা মতামত আছে। আজও শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সঠিক রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়নি।

৪৫.৮.১ বাল্যলীলা (চতুর্থ অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বৃন্দাবনদাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু। এই অধ্যায়ে আমরা নবদ্বীপে তার ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, প্রভুর জানুগতি, সর্পের বৃত্তান্ত, চোরদ্বয়ের বৃত্তান্ত, শচী-জগন্নাথের নূপুর ধ্বনি শ্রবণ, তৈথিক ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রকাশ—ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ পাই। আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত চতুর্থ অধ্যায়েই মূলতঃ শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। 'হাতে খড়ি' থেকে শুরু করে পিতার কাছে 'ছলপড়া' পর্যন্ত এই অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার নানামধুর চিত্র বৃন্দাবনদাস তুলে ধরেছেন।

'হাতে খড়ি'র মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজজীবনে শিশুর বিদ্যার জগতে প্রবেশের সুনা। শুভদিনে শুভলগ্নে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে হাতে খড়ি দেওয়ার প্রথা আজও বিদ্যমান। শিশু-সন্তান এর গুরুত্ব বুঝতে পারে না। অন্যান্য খেলার মতো শিশু 'হাতেখড়ি'কেও একরকম খেলা মনে করে। অবুঝ ক্রিয়া কৌতুকে মত্ত চৈতন্যের হাতে খড়ি দেন জগন্নাথ মিশ্র। এরপরই 'দেবী কর্ণবেদ প্রসঙ্গ'। অন্যান্য শিশু যেমন এই শুভদিনে লিখতে বসে কৌতুকবোধ করে, একটি অক্ষর লিখতেই হিমসিম খায়, শ্রীচৈতন্য তার ঠিক বিপরীত। চোখে দেখেই সে সববর্ণ একের পর এক লিখে যায়। কবির ভাষায়—

"দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বমনে চায়।।"

চৈতন্য যে সাধারণ শিশু নয়, বাল্যলীলার এই 'হাতে খড়ি' অংশেই তার প্রমাণ কবি তুলে ধরেছেন। এরপরই কৃষ্ণের শতনাম লেখা শিক্ষা এবং রাতদিন পঠন পাঠনে মগ্ন চৈতন্য। তার প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণে যেন মধু ঝরতো। সকলেই তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে বিমুগ্ধ। অন্যান্য শিশুর মতই চৈতন্যও পাখা মেলে আকাশে উড়তে চায় এবং পাখা না পেয়ে অঝোরে কাঁদে এবং ধুলায় গড়াগড়ি যায়। কখনও বা আকাশের তারা, চন্দ্রকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়। আত্মীয় স্বজনেরা নানা কথার ছলে তাকে ভোলাতে চায়, তবু সেই অসম্ভব বায়না থামে না। কিন্তু অবাক হতে হয় শত অনুরোধ উপরোধ, স্নেহ-ভালোবাসায় যার জেদ যায় না সেই বালক গৌরাঙ্গ হরিনাম শুনেই চুপ করত। তার হরেক বায়নাও কোথায় যেন হারিয়ে যেত। চৈতন্যের সব চাঞ্চল্যের অবসান ঘটত হরিনামের পীঠস্থানে।

একদিন হরিসংকীর্তনে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস যখন মুখর, তখন চৈতন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। সবাই তার কান্না থামার জন্য শত চেষ্টা করে কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত না করে শুধু অঝোর ঝরে কাঁদতেই থাকে। এটা ওটা দিতে গেলে নিমাই শুধু বলে—

"যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাই।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাই।"

সেখানে পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করে আছেন। তাঁদের শুদ্ধ চিত্তের নৈবেদ্য সবাই যদি খায় তবেই তার অশান্ত হৃদয় হবে শান্ত। সবাই একাদশীর নৈবেদ্য এনে দেবার কথা বলেন। এরপর দুই পবিত্র ব্রাহ্মণ-শিশুর কথা শুনে অবাক হয়ে যান। তাঁর এই শিশুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন এই অভিমত প্রকাশ করে বলেন—

"এই শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।"

তাঁদের প্রদত্ত নৈবেদ্য গৌরাঙ্গ গ্রহণ করে এবং হরিধ্বনি দিয়ে "নাচে প্রভু আপনা কীর্তনে।" ভাবে তন্ময় হয়ে কখনো মাটিতে, কখনো কারো গায়ে, কখনো বা শচী দেবীর কোলে লুটিয়ে পড়ে। তার সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর। তারপর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে দুপুরবেলায় গৌরাঙ্গ গঙ্গার জলে স্নান করতে যায়। নদীবক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে জলকেলিতে মত্ত হয়। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে স্নানরত লোকজন দেখে নিমাই সঙ্গী সাথীসহ সাঁতার কাটছে, কখনো ডুবছে, কখনো ভাসছে। কিন্তু কেউই তাকে ধরতে পারছে না। বয়স্ক লোকেরা গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে জগন্নাথের কাছে নালিশ করে। অভিযোগ গৌরাঙ্গ জল ছিটিয়ে সাধুদের ধ্যান ভঙ্গ করে কারো উত্তরীয় নিয়ে পালায়, পূজার পূর্বেই প্রসাদ খেয়ে পালায়, কারো ধুতি, কারো গীতা নিয়ে পালিয়ে যায়, কারো কানের ভিতর জল দেয়, কারো পিঠে চড়ে বসে, পূজার আসনে বসে, বালি ছিটিয়ে দেয়, স্ত্রীলোকের কাপড় পুরুষের ঘাটে, আর পুরুষের কাপড় স্ত্রীলোকের ঘাটে রেখে দেয়। এককথায় গৌরাঙ্গের দস্যিপনায় ঘাটের সবলোকই অস্থির। নিমাই-এর এসব দুষ্টুমির মধ্যে চিরন্তন শিশুর সহজাত স্বভাবই প্রকাশিত। সমস্ত বালিকার দল শচী দেবীর কাছে নালিশ জানায়—গৌরাঙ্গ তাদের কাপড় চুরি করেছে, শুকনো কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে, ব্রতের ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে, চুলে ওকড়ার ফল দিয়েছে ইত্যাদি। তাদের শুধু এসব অভিযোগ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলে যে শচীমাতা যদি পুত্রের এই দামালপনা বন্ধ

না করেন তবে প্রচণ্ড ঝগড়া হবে বলে শাসায়। সকলের রাগ দুর করার জন্য মা প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি সন্তানকে বেঁধে রাখবেন। পিতাও পুত্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে গৌরাঙ্গের দেখা নেই। পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় শিশুগণ বলে—"আজি স্নানে না আইলা।" ঘাটে পিতার তর্জন গর্জন শুনে নিমাই অন্য পথে পালিয়ে যায়। বাল্যলীলায় চৈতন্যের অশান্ত ব্যবহার সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

"নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে।" হাতে বই নিয়ে বিশ্বম্ভর অন্যপথে বাড়ী ফিরছে। তার সর্বাঙ্গ কালিমাখা। অপূর্ব উপমার সাহায্যে কবি তা বর্ণনা করেছেন—

"লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে।।"

পিতা ঘরে গিয়ে নিমাইকে দেখে সস্নেহে তার বিরুদ্ধে নগরবাসীর অভিযোগের কথা বললে, নিমাই শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে—

"আজ আমি নাহি যাই স্নানে।" অন্য কেউ হয়তো খারাপ ব্যবহার করেছে। তা সত্ত্বেও পিতা অভিযোগের কথা তুললে দৃঢ় কণ্ঠে নিমাই বলে যে কিছু না করেও তাকে দুর্নামের ভাগী হতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিমাই তাদের আলিঙ্গন করে, তারাও নিমাই-এর উপস্থিত বুদ্ধির পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। নিমাই-এর কথাবার্তা শুনে পিতা-মাতা কিছুই বুঝতে পারেন না। তবে মনে মনে তাঁরা ভাবেন—

"এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ জন্মিলা মোর ঘর।।"

বেলা দুইপ্রহরে নিমাই টোলে পড়াশুনার জন্য যায়। তার পঠন-পাঠনে আগ্রহের ও তীক্ষ্নবুদ্ধির নানা চিত্র ও পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্যের বাল্যলীলার বর্ণনার মধ্যে একদিকে যেমন আছে চিরন্তন বাস্তববাদী শিশুর মনস্তত্ত্বের নানা উপাচার, তেমনি মাঝে মাঝে রয়েছে অলৌকিক-বিস্ময়কর জগতের সন্ধান। বিশেষ করে 'হাতে খড়ি'র মুহূর্তে যা দেখে তাই লেখে, হরিনাম শুনে নাচতে থাকে ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে অলৌকিত্বের প্রকাশ আছে। বাস্তববোধ, ভাবাবোধ ও ভক্তিবাদের মিশ্রণে বাল্যলীলার এই অধ্যায়টি সমৃদ্ধ। এই বাল্যলীলার মধ্যেই তৎকালীন পারিবারিক জীবনের ছায়া সম্পাতও ঘটেছে। সহজ, সরল ভাষায়, মাঝে মাঝে অলংকারের দ্যুতিতে অধ্যায়টি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

৪৫.৯ ব্যাখ্যা, টীকা, শব্দার্থ

শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিটি পদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা পড়ে আপনারা পাঠ্য বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারবেন।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

পদ ১।। গৌরসুন্দর — শচীমাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান চৈতন্যদেব নামেই খ্যাত। গৌরকান্তি রূপের জন্য আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ডাকতেন গৌর-গৌরাঙ্গ বা গৌরসুন্দর বলে। সুতরাং এটি চৈতন্যের অন্য ডাক নাম।

পদ ২।। নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন — চৈতন্যদেব ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও গদাধরের জীবন স্বরূপ। নিত্যানন্দ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বীরভূম জেলার একচাকা-খলপপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছোটবেলা থেকেই দেবলীলা-নাটগানে অনুরাগী ছিলেন। ড. সুকুমার সেনের ভাষায়—"নিত্যানন্দ ছিলেন বেশে অবধূত, আকারে মহামল্ল, ভোজনপানে নির্বিকার।" কৃষ্ণলীলা শুনতে ও হরিনাম গানে তার একাগ্র অনুরাগ ছিল। শচীদেবী তাঁকে সন্তানরূপে স্নেহাঞ্চলে বাঁধেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় ছিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে তিনি নীলাচলে আসেন। কিন্তু পরে চৈতন্যদেব তাঁকে বাঙলাদেশে পাঠিয়ে দেন। বৈষ্ণবভক্তগণ নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার মনে করতেন। চৈতন্যের তিরোভাবের আগেই বাঙলাদেশে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের যুগলমূর্তির পূজা আরম্ভ করেন। চৈতন্যের তিরোভাবের আটবছর পরে নিত্যানন্দ স্বর্গারোহণ করেন।

গদাধর ছিলেন নবদ্বীপধামে চৈতন্যের প্রাণের বন্ধু। গদাধরের পিতার নাম মাধব মিশ্র। গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য ছিলেন। 'দ্বিতীয়-চৈতন্য কলেবর' (দ্বিতীয় কায়ম্) রূপে নবদ্বীপ ধামে তাঁর পরিচিতি ছিল। নিত্যানন্দ ও গদাধর শ্রীচৈতন্যের উপাসনায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন।

পদ ৫।। শ্রী সেবাবিগ্রহ — নিত্যানন্দ বলরামের অবতার রূপে নবদ্বীপে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে। বলরামের মতই নিত্যানন্দ দাস্যভাবে মগ্ন হয়ে চৈতন্যের সেবায় তন্ময় থাকতেন। এই একাগ্রমগ্ন সেবা যেন নিত্যানন্দের মধ্যেই মূর্তি (বিগ্রহ) ধারণ করেছিল। 'শ্রী' শব্দটি কবি শ্রদ্ধাবাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পদ ৬।। অবিজ্ঞাত তত্ত্ব — অজ্ঞাত তত্ত্ব। চৈতন্য-নিত্যানন্দ এবং ভক্ত বা পরিকরদের গূঢ় তত্ত্বকথা কেউ জানে না। এই তত্ত্বকেই চৈতন্য-নিত্যানন্দ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১।। ভাগবতে শুকদেবের উক্তি—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার (অজ) অন্তর গভীরে সৃষ্টির স্মৃতি প্রকাশ করতে করতে যাঁর অনুপ্রেরণায় স্বলক্ষণা সরস্বতী (ব্রহ্মা) মুখ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঋষভ) তিনি আমার প্রতি সদয় হোন।

পদ ৮।। নাভিপদ্ম হৈতে — নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম।

পদ ১২।। অচিন্ত্য অগম্য — যা চিন্তার অতীত।

শ্লোক ২।। হে ভূমা — সকলের অন্তর্যামী সর্বব্যাপী পুরুষ-ভগবান।

শ্লোক ৩ ও ৪।। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—জগতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে, অধর্ম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজেকে সৃষ্টি করি। ধর্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পদ ১৭।। যুগধর্ম—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ইত্যাদি প্রতিটি যুগের ধর্ম স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ধর্ম-স্থাপনের জন্যই ভগবান নানা অবতাররূপে আবির্ভূত হন।

পদ ১৯।। সর্ব তত্ত্বসার—শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। চৈতন্যের কৃষ্ণের অবতার বলে প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব। এই তত্ত্বই সর্ব তত্ত্বের সার বলে চিহ্নিত।

পদ ২৩।। বিরিঞ্চি — ব্রহ্মা।

পদ ২৫।। চাটিগ্রামে — চট্টগ্রামে।

পদ ৩৫।। করি পিতা ব্যাজ—বলরাম সকলের পিতা বলে সুচিহ্নিত। তাঁর কোনো পিতা নেই। তবু নিত্যানন্দ রূপে বলরামের আবির্ভাবের ধারণা অনুযায়ী হাড়াই পণ্ডিতকে পিতা অঙ্গীকার (পিতা ব্যাজ) করেছেন।

পদ ৩৯।। তিরোতে—পরমানন্দপুরীর জন্মস্থান তিরোতে অর্থাৎ ত্রিহুতে।

পদ ৪৮।। পবিত্র গঙ্গানদী তীরবর্তী দেশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদদের অবতীর্ণ না করিয়ে কেন এর বাইরে পাপপূর্ণ অপবিত্র দেশে এঁদের অবতীর্ণ করালেন তার কার্য কারণ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পদ ৫৩।। নবদ্বীপ ধামের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের চিত্র বর্ণিত। এর বিস্তৃত বর্ণনা আপনারা ৪৫.৭ (ক) অংশে পাবেন।

পদ ৫৪।। ত্রিবিধ বয়সে—জীবনের তিনটি মূলস্তর — বালক, যুবক ও বৃদ্ধ।

পদ ৫৭।। নাহি সমুচ্চয়—সীমা সংখ্যা নেই অর্থাৎ অসংখ্য।

পদ ৬০-৬১।। মঙ্গলচণ্ডী—চণ্ডীদেবীর কথা এবং ৭ দিন ধরে মঙ্গলচণ্ডী গীত গাওয়া হত। 'জাগরণ পালা'তে রাত জাগতে হত। বিষহরি — যে বিষ হরণ করে অর্থাৎ দেবী মনসা।

পদ ৬৫।। না বাখানে — ব্যাখ্যা করে না।

পদ ৭৪-৮১।। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—নবদ্বীপের হাতে গোনা যে ক'জন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্টের লাউড়ে। পিতার সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন। শান্তিপুরে স্থায়ী বাসস্থান থাকলেও তিনি নবদ্বীপে বসবাসের স্থান রেখেছিলেন এবং টোলও খুলেছেন। অদ্বৈত মহাপণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধ, শৈব ও যোগী-তান্ত্রিকদের 'চর্যা গান ছড়াও তিনি জানতেন। মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য বলে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। বৈষ্ণবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারে অভিভাবকত্বের মর্যাদা পেয়েছেন। তিনি ছিলেন 'জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু।' নবদ্বীপে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেই তিনি ভক্তি সাধনার ধারা নবদ্বীপের বুকে ছড়িয়ে দেন। অদ্বৈতের আহ্বানেই চৈতন্যদেব সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে নাম প্রচার করে সকল জীবের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন।

পদ ৯২।। চৈতন্যবিলাস—নবদ্বীপে পাষণ্ডীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণব গোষ্ঠী মিলিত হয়ে রুদ্ধ দ্বারে সংকীর্তন করতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে চৈতন্যদেব প্রায় ১ বছর শ্রীবাসের গৃহে রাত্রে ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করেছেন এবং বিভিন্ন লীলা (বিলাস) প্রকাশ করেছেন।

ত্রিকাল করয়ে-প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে বৈষ্ণব ভক্তগণ গঙ্গা স্নান করে কৃষ্ণ পূজা সম্পন্ন করতেন।

পদ ১০৯।। মহাতীব্র নরপতি যবন—মহাপ্রতাপান্বিত মুসলমান রাজা।

পদ ১১৭।। স্কন্ধনাশ—স্কন্ধ-অর্থ গাছের গুঁড়ি। কবি এই গুঁড়ির সঙ্গে বৈষ্ণব বিরোধী পাষণ্ডীদের তুলনা করেছেন। গুঁড়ি থেকে যেমন ডালপালা বের হয় ঠিক তেমনি পাষণ্ডীদের মুখে বৈষ্ণব বিরোধী নিন্দাবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাষণ্ডীদের বিনাশ করলেই-নবদ্বীপে বৈষ্ণব বিরোধী কর্ম-কাণ্ড বন্ধ হবে।

পদ ১৩০।। অবধূতবেশ—অবধূত নানারূপ বেশ ধারণ করেন। চৈতন্যভাগবতে অবধূতের বেশ বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

‘বেত্রবান্ধা এক কাণা কুম্ভ বামহাতে।
নীল বস্ত্র পরিধান নীলবস্ত্র সাথে।।”

এছাড়াও আছে—“বামশ্রুতি মূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।”

পদ ১৩৪।। কশ্যপ—সকল দেবতার পিতা।

পদ ১৪৬।। অতিমহাবেদ গোপ্য—এসব তত্ত্ব কথা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ বেদেও গুপ্ত আছে।

পদ ১৫৭-১৬০।। সত্যযুগে অবতারের বর্ণনা আছে।

পদ ১৬৫-১৭৫।। এই পদগুলিতে বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা আছে। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

হয়গ্রীবরূপে বিষ্ণু পাতালে মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ংকর দৈত্যকে নিহত করে পবিত্র বেদ উদ্ধার করেন।

হিরণ্য-বিদার — নৃসিংহ অবতারে বিষ্ণু প্রহ্লাদের পিতা হরিণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করে তাকে বধ করেছিলেন।

সর্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধী — দ্বাপরে কৃষ্ণের অবতারে সমস্ত লীলার প্রকাশ।

কলিযুগে চৈতন্য অবতার। চৈতন্য অবতারে কৃষ্ণ হয়েছেন ভক্তির বিষয়।

সর্বশক্তি পরচারি — চৈতন্য অবতারে কৃষ্ণ সকল শক্তিকে নিয়োগ করেন সংকীর্তন প্রচারের মধ্যে।

পদ ১৮৬।। গঙ্গার পুরিল মনোরথ—দ্বাপরে কৃষ্ণ যমুনার তীরে লীলা করেছিলেন কিন্তু চৈতন্য অবতারে তিনি গঙ্গার তীরে লীলা করবেন। গঙ্গার এইরূপ বাসনাই ছিল—সেই মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

পদ ২০৪।। রাহু কবল ইন্দু — চন্দ্ররাহু গ্রাসিত। অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ।

পদ ২০৪-২০৬।। পঁহু — প্রভু শব্দটি ব্রজবুলি গাজে — গর্জন করে। বেণু-বিষাণা — বাঁশি ও শিঙ্গা।

পদ ২২৫-২৩০।। ডিন্ডিম — ঢোল জাতীয় বাদ্য।

পদ ২৩৯-২৪৪।। চক্রবর্তী লীলাম্বর — ইনি চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবীর পিতা।

পদ ২৪৫-২৫৮।। বিপ্ররূপে এক মহাজন—চৈতন্যের জন্মলগ্নে উপস্থিত ব্রাহ্মণবেশী এক মহাত্মা। যিনি নবজাতকের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করেন।

।। তৃতীয় অধ্যায়।।

পদ ২।। অমায়ায় — দ্বিধাহীন চিত্তে, অকপটে।

পদ ৬।। আপ্তবর্গ — আত্মীয়-স্বজন।

পদ ১৮-২২।। সমাজ সংস্কারের নানা কথা আছে।

পদ ২৯-৩৫।। গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় নিজের রূপ গোপন করে তিনি বালক শ্রীকৃষ্ণের মতো লীলা করেন।

পদ ৪৫-৫০।। শ্রীচৈতন্যের নানা নামকরণ। বিশ্বম্ভর — বিশ্বকে যিনি ধারণ ও পোষণ করেন।

পদ ৬৫।। জানুগতি চলে — হামাগুড়ি দিয়ে চলে।

পদ ৭০-৭৪।। গরুড় — বিষ্ণুর বাহন। সর্পকুলের শত্রু।

পদ ৯৯।। বিহাণে — প্রভাতে।

পদ ১৩৩।। বস্ত্র শিরে রান্ধি তার — মধ্যযুগে মাথায় নূতন বস্ত্র বেঁধে দেওয়া সম্মানসূচক শিরোপা রূপে চিহ্নিত ছিল।

পদ ১৫৮-১৬২।। তৈর্থিকব্রাহ্মণ — যে ব্রাহ্মণ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান।

পদ ১৯৭।। অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি — 'ঢাঙ্গাতি' শব্দের প্রাচীন অর্থ — প্রবঞ্চক, প্রতারক। কিন্তু কবি এখানে শিশু চৈতন্যের উদ্দেশ্যে 'দুষ্টু' - 'দস্যি' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পদ ২০৮-২১১।। একরড় — একদৌড়ে বা এক ছুটে।

পদ ২৯৭।। সুতিয়া থাকিল — শুয়ে রইলেন। যোগনিদ্রা প্রভাবে — যোগমায়ার নিদ্রার প্রভাবে।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

পদ ২-৩।। শ্রীচূড়াকরণ — হাতে খড়ির পর গৌরাঙ্গের কর্ণভেদ চূড়াকরণ সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে শিশুর মাথায় নাপিত প্রথম ক্ষুর ছোঁয়ায় এবং কানের লতি ছিদ্র করে।

পদ ২১-৩৩।। অভেদ জীবন — জগদীশ পণ্ডিত ও জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন খুবই অন্তরঙ্গ।

শ্রীহরিবাসর — একদশী ব্রত।

পদ ৫৪-৫৬।। কুল্লোল প্রদান — কুলকুচির জল ছিটিয়ে দেওয়া।

পদ ৮৪।। এড়িমু বান্ধিয়া — নিমাই-এর বিরুদ্ধে নারীদের অভিযোগের পর মাতা শচীদেবী বলেন—পুত্রকে 'বেঁধে আটকে রাখবো।'

পদ ৯৮।। কতিগেলা — কোথায় গেল?

পদ ১২৩-১২৪।। অব্যভার — অব্যবহার, খারাপ ব্যবহার।

বিশেষ বিশেষ পদ্যাংশের ব্যাখ্যা করা হলো। এই ব্যাখ্যাদি পাঠ করে টীকা-শব্দার্থ জেনে আপনারা যে-কোনো পদাংশের ব্যাখ্যা লিখতে পারবেন।

(ক) (১) "পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক হয় সুনির্মল।। ১৭৮
বাহুতুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশঃ, হেন নিত্য হেন তোর দাস।। ১৭৯
(দ্বিতীয় অধ্যায়)

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনী সাহিত্য রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-ভাগবত" কাব্য গ্রন্থের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় তথা 'শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্মবর্ণন' থেকে গৃহীত হয়েছে।

হরিনাম সংকীর্তনের মাঙ্গলিক দিকটি কবি তুলে ধরেছেন। যে-কোনো কৃষ্ণভক্ত নাম সংকীর্তনের সময় নৃত্যকালে তাঁর পদযুগলের তালে তালে পৃথিবীর দৃষ্টিতে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ইত্যাদি দশ দিকের এবং

ঊর্ধ্ববাহুতে স্বর্গের সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়। নাম সংকীর্তনের সীমাহীন মাহাত্ম কবি এই পদ্যাংশে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে ব্যক্ত করেছেন।

(২) 'বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান।।" ২৪৪ (ঐ)

(আরম্ভ পূর্বের ব্যাখ্যা অনুসারী হবে)

শচীমাতার ঘর আলো করে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গের জন্মের পর নবজাত শিশুকে ঘিরে আনন্দ ধারা বয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে এক মহা জ্যোতির্বিদের আবির্ভাব। তিনি জন্ম লগ্নাদি বিচার করে ভবিষ্যদবাণী করেন যে—শচীমাতার নবজাত পুত্র বৃহস্পতিকে জয় করে জগৎখ্যাত বিদ্যাবান বলে পরিচিতি লাভ করবে। শুধু তাই নয়—অল্প বয়সেই সকল মানবিক উজ্জ্বল গুণাদির অধিকারী হয়ে খ্যাতি অর্জন করবেন। তৎকালীন যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় এই অংশে পাওয়া যায়।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

(৩) "সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ।।" ৭৯

আলোচ্য পদটি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় থেকে সংকলিত। 'নামকরণ ও চাপল্য বিলাসাদি বর্ণনে'-র মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের শিশুবয়সের সৌন্দর্য্যের দিকটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। শিশু চৈতন্যের সুন্দর মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, চোখ দুটি পদ্মফুলের মতো। লেখকের ভাবনায় শিশু গোপালের রূপ-বেশ যেন চৈতন্যের মধ্যে প্রতিভাত।

(৪) " বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যেদিনে যে হৈব তা হইবারে চায়।।" ২১৮

(আরম্ভ পূর্বের মতই, তবে প্রসঙ্গ ভিন্ন)

চৈতন্যের চাপল্যের সীমা নেই। এক তীর্থ ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথিরূপে আসেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মণ দু'বার নিজ হস্তে রান্না-বান্না করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন মুহূর্তে গৌরচন্দ্র ছুটে এসে সেই অন্ন মুখে তুলে নেয়। ব্রাহ্মণ তা দেখে 'হায়-হায়' করে উঠলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে যখন শাস্তি দেবার জন্য লাঠি নিয়ে তাড়া করেছেন, তখন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের হাত ধরে কথাগুলি বলেন। বালকের মন পবিত্র নিষ্পাপ। তারা খেয়াল খুশির স্রোতে ভেসে বেড়ায়। তাই তাঁর নিবেদিত অন্ন গ্রহণের মধ্যে শিশুর কোনো দোষ নেই। তাছাড়া যেদিনে যা ঘটবে তা ঘটবেই। শত চেষ্টা করেও তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁর অন্ন গ্রহণ করবেন না বলেই হয়তো এমনটি হয়েছে। শিশু গৌরাঙ্গের প্রতি চরম মমতা ও ভবিতব্যকে মেনে নিয়েই ব্রাহ্মণ কথাগুলি বলেছেন।

।। চতুর্থ অধ্যায়।।

"সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।।" ২৩

(আরম্ভ পূর্ববৎ শেষাংশ নিম্নরূপ)

শৈশবে গৌরাঙ্গ গোপাল কান্দাকাটি শুরু করলে হরিনাম শুনেই শান্ত হতো। কিন্তু আজ ভিন্ন রূপ। গৌরাঙ্গ অঝোরঝরে কাঁদছে—শত প্রলোভনে এমনকি হরিনামের কথাতেও তারা কান্না থামে না। সে শুধু জগদীশ পণ্ডিত হিরণ ভাগবতের ঘর থেকে একাদশী উপবাসের বৈষ্ণু-নৈবেদ্য আনতে বলে। একাদশীর নৈবেদ্য খেতে পেলেই সে কান্না থামিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।

(৬) "ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বোলে জল দিয়া ভাঙে মোর ধ্যান।।" ৬৭

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতের চতুর্থ অধ্যায়ে 'শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' অংশের এই পদটিতে গঙ্গার ঘাটের সাধুদের দস্যি নিমাই সম্পর্কে নানা অভিযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিমাই-এর চাপল্য ও দুষ্টুমি বুদ্ধিতে গঙ্গা ঘাটের সব স্নানার্থীই অতিষ্ঠ। তাদের কেউ কেউ জগন্নাথ মিশ্রের কাছে শিশু গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে তাঁর পুত্রের জ্বালায় কেউই প্রাণমন ঢেলে স্নানাদি কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। গঙ্গাতীরের ধ্যান তন্ময় সাধুদের অভিযোগ এই যে গৌরাঙ্গ জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁদের ধ্যান ভঙ্গ করে। শিশু গৌরাঙ্গের চাপল্যের দৃষ্টান্তে অংশটি ভরা।

৪৫.১০ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তরদান শেষে ..... পাতার উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানডিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) চৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের জ্যৈষ্ঠ পুত্র।	☐	☐
(খ) চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস।	☐	☐
(গ) চৈতন্যের 'নিমাই' নাম রাখেন সীতাদেবী।	☐	☐
(ঘ) নবদ্বীপধাম চৈতন্য যুগে অবহেলিত ছিল।	☐	☐
(ঙ) অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যের বয়োকনিষ্ঠ।	☐	☐
(চ) শ্রীচৈতন্য ছোটবেলায় শান্তশিষ্ট ছিল।	☐	☐
(ছ) চৈতন্য হরিনাম শুনে শান্ত হতেন।	☐	☐
(জ) নবদ্বীপ গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য লোক স্নান করতো।	☐	☐

	ঠিক	ভুল
(ঝ) চৈতন্য জন্মলগ্ন মুহূর্তে নবদ্বীপে জনগণের মধ্যে নিবিড় ঐক্য ছিল।	☐	☐
(ঞ) চৈতন্যের মুখ চাঁদের মতো ছিল।	☐	☐

২। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(ক) স্বভাবেহ —————— কারুণ্য হৃদয়।

(খ) রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা —————— রাম।

(গ) ———— ———— বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।

(ঘ) দিনে দিনে বাড়ে প্রভু ————।

(ঙ) —————— সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।

(চ) প্রভু বলে আজি —————— নাহি যাই স্নানে।

৩) নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক (√) চিহ্ন দিন এবং ..... পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন—
(১) ১৪৮০ খ্রিঃ
(২) ১৫১০ খ্রিঃ
(৩) ১৪৮৬ খ্রিঃ

(খ) চৈতন্যের আত্মীয়-স্বজন তার নাম রাখেন—
(১) বিশ্বম্ভর
(২) গৌরাঙ্গ
(৩) নিমাই

(গ) নিত্যানন্দ পরিচিতি ছিলেন—
(১) কৃষ্ণরূপে
(২) বিষ্ণুরূপে
(৩) বলরামরূপে

(ঘ) চৈতন্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জলকেলি করতেন—
(১) গঙ্গা বক্ষে
(২) যমুনা নদীতে
(৩) পদ্মা নদীতে

(ঙ) দুই চোর চৈতন্যকে কাঁধে করে নিয়ে পালানোর সময় চৈতন্য—

(১) কেঁদেছে
(২) হেসেছে
(৩) ছট্‌ফট্‌ করেছে

(চ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত সমাপ্ত হয়েছে—

(১) পাঁচ খণ্ডে
(২) তিন খণ্ডে
(৩) চার খণ্ডে

(ছ) বৃন্দাবনদাসের কাব্যগ্রন্থের প্রথম নাম ছিল—

(১) চৈতন্যমঙ্গল
(২) চৈতন্য চরিতামৃত
(৩) চৈতন্যভাগবত

৪। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানির নামকরণের তথ্যাদি ১৫টি বাক্যে নিজের ভাষায় প্রকাশ করুন।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৫। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

_____

_____

_____

_____

_____

৬। চৈতন্য ভাগবতের ২য় অধ্যায় থেকে ৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত ৩টি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করো। সেগুলি থেকে যে-কোনো একটি অলৌকিক ঘটনা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৭। চৈতন্যদেবের জীবনীর বিভিন্ন স্তরের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করুন।

৮। নবদ্বীপের জীবন চিত্র নিজের ভাষায় দশটি বাক্যে প্রকাশ করুন।

৯। চৈতন্যদেবের সমকালীন সমাজচিত্রের বাস্তব রূপ রেখাটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

১০। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাখ্যা করুন।

(ক) "কলিযুগে সর্ব ধর্ম হরি সংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রী চৈতন্য নারায়ণ।" ২০

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

(খ) "সর্ব নবদ্বীপে দেখ হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গালধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন।।" ১৯৪

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

(গ) "সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গান।।" ৫৫

(তৃতীয় অধ্যায়)

(ঘ) "পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজনে।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবনে।।" ১১৯

(তৃতীয় অধ্যায়)

(ঙ) "ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর।।" ৪২

(চতুর্থ অধ্যায়)

(চ) "এই মত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়ায়।।" ১৩৮

(তৃতীয় অধ্যায়)

১১। তিন চারটি বাক্যে নিম্নের এক একটি টীকা নিজের ভাষায় লিখুন।

(ক) অদ্বৈত আচার্য, (খ) তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, (গ) নিত্যানন্দ।

(ঘ) জগন্নাথ মিশ্র (ঙ) চৈতন্য বিলাস, (চ) বিশ্বম্ভর।

১২। নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

(ক) পঁহু, (খ) ডিন্ডিম, (গ) আপ্ত বর্গ, (ঘ) বিহানে, (ঙ) একরড়,

(চ) কতিগেলা, (ছ) অব্যভার, (জ) না বাখানে, (ঝ) তিরোতে, (ঞ) বিরিঞ্চি।

১৩। বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত ছাড়া আর কয়েকজন কবিও তাঁদের গ্রন্থের নামকরণ যাঁরা চৈতন্য জীবনী বাঙলা ভাষায় লিখেছেন।

৪৫.১১ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ভুল, (চ) ভুল, (ছ) ঠিক, (জ) ঠিক, (ঝ) ভুল, (ঞ) ঠিক।

২। (ক) অদ্বৈত, (খ) নিত্যানন্দ, (গ) হরি-হরি, (ঘ) শ্রী শচীনন্দন, (ঙ) নদীয়ার, (চ) আমি।

৩। (ক) ৩, (খ) ২, (গ) ৩, (ঘ) ১, (ঙ) ২, (চ) ২, (ছ) ১।

৪। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। 'অপ্রামানিক প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে "শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গাল" ছিল। বৃন্দাবন মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।" শ্রীখণ্ডের 'প্রাচীন বৈষ্ণব' নামে গ্রন্থেও বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গাল রূপে চিহ্নিত। একই নামে একাধিক লেখকের গ্রন্থ পাঠক, সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে ভেবে এবং মাত্রা নারায়ণী দেবীর নির্দেশে বৃন্দাবনদাস নিজেই তাঁর গ্রন্থের নাম 'ভাগবত' রাখার নির্দেশ দেন বলে 'প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিন্তু কবির ভাবশিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতে' সর্বত্রই বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে 'চৈতন্যমঙ্গাল' রূপে চিহ্নিত করেছেন। কারো কারো মতে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনার পর বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে 'ভাগবত' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।।"

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের লীলার অভেদত্বের জন্যই গ্রন্থটির নাম 'ভাগবত' এবং গ্রন্থকারের নাম 'ব্যাস বা বেদ ব্যাস' আরোপিত হয়েছে। তবে এই মতটি সর্বসম্মত নয়। গবেষকগণ বৈষ্ণব গ্রন্থাদির মধ্যে সবচেয়ে যে পুঁথি বেশী সংখ্যায় পেয়েছেন তা 'চৈতন্যভাগবতে'র। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে একটিতেও 'চৈতন্যমঙ্গাল' নামটি নেই। লোচনদাস ও তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' নামটির কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"শ্রী বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগৎমোহিত যার ভাগবত গীতে।।"

জয়ানন্দ ও বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে 'চৈতন্যভাগবত'ই বলেছেন। 'ব্যাস' নামটিও চৈতন্য চরিতামৃতের আগে কর্ণপুরের গৌর গনোদ্দেশ দীপিকাতে ও বৃন্দাবনদাসকে 'বেদব্যাস' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম থেকেই যে 'চৈতন্যভাগবত' ছিল এবং এই নামকরণের ব্যাপারে বৃন্দাবনদাসই যে মূল হোতা এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

৫। **ঐতিহাসিক গুরত্ব ঃ** মধ্যযুগে নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম বাল্যলীলার নানা ঘটনা, তারপর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ, পদব্রজে ভারতভ্রমণ এবং জীবনের শেষ দিনগুলি নীলাচলে অবস্থান করে রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত অবতাররূপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বজনস্বীকৃত। মানবতাবাদে পূজারী ভক্তিরসস্নাত মিলন মঞ্চের স্রষ্টা বাঙলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ। ভক্তবৃন্দের কাছে ছিলেন ভগবানের অবতার। বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ—এই দ্বৈতরূপের সমন্বায়িত অবতার রূপেই তিনি অনুগামীদের দ্বারা পূজিত। চৈতন্য জীবনীকারগণ চৈতন্যদেবের খুঁটিনাটি, তাঁর জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে যে সব জীবনী কাব্য রচনা করেছেন তাতে নানা অলৌকিকতার পাশাপাশি, চৈতন্যদেবের লৌকিক জীবনের ইতিহাসও বাস্তব রসে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্যই চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ঐতিহাসিকদের কাছ এক মূল্যবান দলিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' — চৈতন্যদেবের ইতিহাস সমৃদ্ধ জীবনের প্রথম সার্থক সম্পদ।

ভক্তির অতিশয্য ও অলৌকিকতায় প্রগাঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও নবদ্বীপকেন্দ্রিক ধর্ম আন্দোলনের প্রতিটি স্তর বৃন্দাবন

দাস নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা তত্ত্ব ও তথ্য ও গ্রন্থে আছে। নবদ্বীপ ছিল বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নানা ধর্ম-কর্ম হত।

"মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষ হরি পুজে কোন্ জনে।।"

এছাড়া 'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা করে।' বড়লোকেরা জলের মতো বিনা কারণে অর্থ ব্যয় করত। 'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।' বৈষ্ণবদের প্রতি পাষণ্ডদের অত্যাচার, উপহাস কবির লেখনীতে ধরা পড়েছে—

"সকল পাষণ্ড মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে।"

কিছু কিছু সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধ ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবের কথাও আছে। অবক্ষয়ী সমাজের চিত্র অঙ্কণে কবির ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে বাঙলার শাসন-ব্যবস্থা মুসলমান কাজীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। অত্যাচার-উৎপীড়ন চলত, জাত-পাতের ভেদবুদ্ধিতে সমাজ কলুষিত ছিল, জগাই-মাধাইরূপী গুণ্ডাদের তাণ্ডব চলত। হোসেন শাহের শাসনব্যবস্থাকে কবি 'পরম দুর্বার' বলে চিহ্নিত করেছেন। উড়িষ্যার যুদ্ধকালে সুলতানের ধ্বংস লীলা, ভক্ত হরিদাসের বিরুদ্ধে শরিয়তি আইনানুসারে অন্যায়-অবিচার, চৈতন্যের কীর্তনকে নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি ইতিহাস সম্মত।

ভগবানের অবতার লীলার কাহিনী বর্ণনা করেও বৃন্দাবনদাস ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে নানা অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে ক্রন্দনরত শ্রীচৈতন্যের হরিনাম শ্রবণে শান্ত হওয়া, দুই চোরের কাঁধের উপর চৈতন্যের হাসি, জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবতের একাদশী ব্রতের নৈবেদ্যের জন্য চৈতন্যের কান্নাকাটি উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত ঘটনাগুলির মধ্যে যে ঘটনাটি আপনাদের ভাল লাগে তা মূল পাঠ ও সারাংশের সাহায্যে নিজের ভাষায় লিখুন।

৭। ৪৫.৮ অংশে শ্রীচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশ পাঠ করে জন্ম লগ্ন, শৈশব, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, ভারত ভ্রমণ, নীলাচলে দিব্যোন্মাদ অবস্থা ইত্যাদি অবলম্বনে নিজের ভাষায় প্রশ্নটির উত্তর দিন।

৮। ৪৫.৭ (ক) 'নবদ্বীপ চিত্র' অংশটি পাঠ করে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় উত্তর দিন। তবে নবদ্বীপের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎটির তত্ত্ব তথ্যাদি সহ উত্তরটি যাতে সমৃদ্ধ হয় সেদিকে নজর রাখবেন।

৯। ৪৫.৭ এর 'ঘ' সমাজচিত্র' অংশটি যথাযথ পাঠ করে রাজনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় আচার-আচরণের দৃষ্টান্ত সহ উত্তরটিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য সচেষ্ট হবেন।

১০। ৪৫.৯ অংশে কয়েকটি পদের ব্যাখ্যা করা আছে। সেগুলি পাঠ করে এই ব্যাখ্যাগুলি নিজের ভাষায় লিখুন। তবে অনুশীলনীর ব্যাখ্যাগুলি লেখার জন্য সংক্ষিপ্ত সূত্র প্রদত্ত।

(ক) চৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপধামে নানা ধর্মের লোকজনের মধ্যে বিরোধ বিবাদ ছিল, জাত-পাতের বৈষম্যও প্রকট ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবকে ঘিরে সর্ব-জাতির সমন্বয় ঘটে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হরিসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে নিবিড় ঐক্য গড়ে ওঠে।

(খ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ মুহূর্তে শচীমাতার গর্ভে চৈতন্যের জন্ম। শিশুর জন্ম মুহূর্তে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে শ্রীহরিকীর্তনও দিকে দিকে মহানন্দের ঢেউ জাগায়।

(গ) 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানে নানা দ্রব্যাদি ছড়ানো ছিল। কিন্তু চৈতন্য অন্য কিছুতে হাত না দিয়ে পবিত্র ভাগবত গ্রন্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সবাই অবাক বিস্ময়ে তা দেখে।

(ঘ) দুই চোর যখন চৈতন্যকে চুরি করে নিয়ে যায় তখন চৈতন্যকে দেখতে না পেয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়। আত্মীয়-স্বজন দিশেহারা। কবি বাস্তব-উপমা দিয়ে তাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, তেমনি নিমাই হারা আত্মীয় পরিজনও মৃতপ্রায়।

(ঙ) বিশ্বম্ভর অর্থাৎ চৈতন্য শৈশবে দূরন্ত ছিল। কিন্তু হরিসংকীর্তন শুনলেই তিনি শান্ত হয়ে যেতেন। কীর্তনের সময় শিশু বিশ্বম্ভরও তন্ময় হয়ে যায়। শচীদেবীর অঙ্গনে চাঞ্চল্য রসে মগ্ন নিমাই-এর বন্ধু হয়েছে বহু শিশু। তাদের সঙ্গে তার বিচিত্র খেলায় সময় কাটাত।

(চ) চঞ্চল দস্যি ছেলে চৈতন্য তার বিরুদ্ধে কত না নালিশ? কিন্তু তার বিস্ময়কর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কেউই ধরতে পারে না, ভগবানের অবতার রূপে চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ নবদ্বীপবাসী বুঝতে পারছে না।

১১। ৪৫.৯ অংশের টীকা অংশ পড়ে অনুশীলনীর টীকাগুলির উত্তর দিন।

১২। (ক) প্রভু, (খ) ঢোল জাতীয় বাজনা, (গ) আত্মীয়-স্বজন, (ঘ) সকালে, (ঙ) একদৌড়ে, (চ) কোথায় গেল? (ছ) খারাপ ব্যবহার, (জ) ব্যাখ্যা করে না, (ঝ) ত্রিহুতে, (ঞ) ব্রহ্মা।

	কবির নাম		**গ্রন্থের নাম**
১৩। (ক)	কৃষ্ণদাস করিবাজ	—	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(খ)	লোচন দাস	—	চৈতন্যমঙ্গাল
(গ)	জয়ানন্দ	—	চৈতন্যমঙ্গাল
(ঘ)	গোবিন্দদাস	—	গোবিন্দদাসের কড়চা
(ঙ)	চূড়মণি দাস	—	গৌরাঙ্গ বিজয়

৪৫.১২ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক ঃ

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম পর্যায়)—	ড. সুকুমার সেন।
২। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—	ড. ভূদেব চৌধুরী।
৩। বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত —	ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। বৃন্দাবন দাস - চৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড)—	ড. অবন্তীকুমার স্যানাল।